চন্দননগরের নাট্যধারা

প্রথম খণ্ড

শ্রী মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

(অক্টোবর/১৯০৫ - ১৩/১১/১৯৬৬)

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে (বুধবার, ৮ই কার্ত্তিক, ১৩১২ সাল) ২৪ পরগনা জেলার সুকচর গ্রামে দাদামশাই প্যারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে অবিনাশ চন্দ্র গাঙ্গুলী এবং তুলসী দেবী। প্রথমা কন্যার পর পুত্রলাভের এই আনন্দ সংবাদে গর্বিত পিতা অবিনাশ গাঙ্গুলী তখন সাঁওতাল পরগনার সকরিগলি ঘাটের স্টেশন মাস্টার। সাতটি ছেলেমেয়ের মধ্যে তিনি তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান। প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা প্রয়াত হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ছিলেন তাঁর সহোদর। তাঁদের পৈতৃক বাড়ি ছিল হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন্নগরের হাতিরকুল গ্রামে। তাঁর স্ত্রীর নাম কমলা দেবী। তাঁদের ছটি পুত্রসন্তান। প্রখ্যাত চিত্র, মঞ্চ ও যাত্রাশিল্পী কালিদাস গাঙ্গুলী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অপর দুই পুত্র অমিতাভ ও প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলীও সুঅভিনেতা।

বাবা - মায়ের সঙ্গে গিরিডি, রাণীগঞ্জ, ভাগলপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্টেশনে কেটেছে তাঁর শৈশবকাল। অবশেষে চন্দননগরে এসে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত হলেন অবিনাশবাবু। বালক নৃপেন্দ্রনাথ ভর্ত্তি হলেন কলেজ দ্যুপ্লেক্সে (অধুনা কানাইলাল বিদ্যামন্দির), সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন তিনি। সুকণ্ঠী, মিতভাষী, মধুর স্বভাব, সদাপ্রফুল্ল, তীক্ষ্ণধী এবং গৌরবর্ণ এই সুদর্শন বালক ছাত্র ও শিক্ষকমহলের প্রীতি - আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠলো। ছাত্রমহলে তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছিল - 'দেখন হাসি, লাল ছেলে'। স্কুলের বাৎসরিক উৎসবে চারু চন্দ্র রায় রচিত 'ঘড়ি মেলাও' কবিতাটি আবৃত্তি করে চারুচন্দ্র রায়, নারায়ণ চন্দ্র দে, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিক্ষকদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন নয়নের মণি। 'বেজায় রগড়' নাটকাভিনয় দেখে এসে সেই নাটকের প্রতিটি চরিত্র সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন সকলের সামনে। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি অশৌচ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে চন্দননগর কলেজ থেকে সসম্মানে আই. এস. সি. পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম বিভাগে। কিন্তু তারপরেই সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর উপর। স্নেহময়ী মা ও নাবালক ভাই-বোনেদের কথা ভেবে তিনি পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে প্রবেশ করেন কর্মজীবনে। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। রেলকর্মী হিসাবে টিকিট-কালেক্টার পদে চাকরি করার সময় তাঁকেও বর্দ্ধমান, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন স্টেশনে ঘুরতে হয়েছে। শেষজীবনে হাওড়া স্টেশনে এসে টিকিট কালেক্টার ইন্সপেক্টর হিসাবে পদোন্নতি হয় তাঁর এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ৫৮ বছর বয়সে তিনি চাকরি থেকে অবসর

গ্রহণ করেন।

মায়ের ইচ্ছায় হাওড়া জেলার বালী রামনবমীতলার তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি মাতৃহারা হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বছর। পিতৃহারা হয়ে মায়ের পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়ে যিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনিই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ায় মাত্র দুবছরের বড় দিদি স্নেহলতা তাঁকে মায়ের স্নেহে বুকে তুলে নিয়ে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ''কাঁদিসনে নেপু, আমি তো রয়েছি ভাই।'' অকাল বিধবা সেই দিদি তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভাইকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি।

আঘাতের পর আঘাত এসেছে তাঁর জীবনে। পেয়ে হারানোর যে কি বেদনা তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তাঁর প্রথম শিশুপুত্রের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মাধ্যমে।

মাত্র ষোল বছর বয়সে দেশশ্রী হরিহর শেঠ রচিত 'অভিশাপ' নাটকে 'সত্যেন' চরিত্রে তিনি সর্বপ্রথম মঞ্চে অবতরণ করেন এবং নাট্যজীবনের দ্বিতীয় স্বাক্ষর রাখেন কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যশিল্পী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'রণভেরী' নাটকে 'কুমার'-এর ভূমিকার সার্থক রূপায়ণের মাধ্যমে।

নাটক অভিনয় করার ক্ষেত্রে তাঁর যা কিছু প্রেরণা, যা কিছু উদ্দীপনা তার সবটাই এসেছে তাঁর নিজের কাছ থেকে।

আশা ও নিরাশা, আনন্দ ও বেদনা, আসক্তি ও নিরাসক্তির লীলাখেলা ধীরে ধীরে তাঁর কাছে উন্মুক্ত করে দেয় জীবনদর্শনের পথ। দুঃখ ও বেদনাকে ভুলে থাকার জন্য তিনি আঁকড়ে ধরেন নাটককে। সুশীল নাগ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার দে, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বের সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন ''লা সোসিয়েতে দে পারেসে'' নাট্যসংস্থার অর্থাৎ ''অলস মানুষদের সংস্থা''। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় সেখানে একে একে অভিনীত হতে থাকে 'ব্রতচারিণী', 'বাংলার মেয়ে', 'মা', 'সীতা', 'আলমগীর', 'কারাগার', 'চিরকুমার সভা', 'ষোড়শী', 'বিজয়া', 'শ্রীমধুসূদন', 'স্বর্গ হতে বড়' প্রভৃতি নাটকগুলি। নৃপেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নট এবং নাট্যপরিচালক।

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর অভিনয়শৈলী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় যা তিনি অনুকরণ করে মঞ্চে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁর অভিনীত বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে — সীতা (রাম), আলমগীর (ঔরংজেব), শ্রীমধুসূদন (মাইকেল), বিজয়া (রাসবিহারী), ষোড়শী (জীবানন্দ) প্রভৃতি। তাঁর ঐ অসাধারণ অভিনয় এবং চরিত্র সৃষ্টি দেখার জন্য দর্শকবৃন্দ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করতেন 'লা সোসিয়েতে দে পারেসে'র পরবর্তী অভিনয়ের জন্য।

'সীতা' নাটকে তাঁর অভিনীত 'রাম' এবং দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীতা' আজও কিংবদন্তি হয়ে আছে। এই চরিত্রে অভিনয় করেই তিনি বর্ধমান, বহরমপুর ও অন্যান্য রাজবাড়ির রাজাদের কাছ থেকে পেয়েছেন বহু স্বর্ণপদক। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বহু পদক ও পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তিনি। অফিস ক্লাবেও বহু অভিনয় করেছেন এবং যথারীতি পুরস্কারও পেয়েছেন প্রচুর। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের 'নট ও নাটক' নাট্যসংস্থা থেকে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর অভিনয় প্রতিভা ও পরিচালনার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

বহুল গুণের অধিকারী নৃপেনবাবুর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল নিষ্ঠা ও সময়ানুবর্তিতা। কি নাটকের মহলাকালে, কি নাটক অভিনয় শুরু করার ক্ষেত্রে, সব ব্যাপারেই তিনি পুরোপুরি সময় মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই ব্যাপারে কোনদিন কোন আপস তিনি করেন নি।

স্নেহময়ী দিদির অকাল বৈধব্য, পুত্র দুর্গাদাসের অকালমৃত্যু, চার বছর বয়সে বারবার টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন অতি প্রিয় সহোদর দ্বিজেনের (কালো) মৃত্যু, প্রিয় ভগ্নী ও ভগ্নীপতির বিয়োগব্যথা এবং আরও অনেক ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা তাঁর মন ও দেহযন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর (রবিবার, ২৭শে কার্ত্তিক, সন ১৩৭৩ সাল) অনেক ব্যথা-বেদনা বুকে নিয়ে মাত্র ৬১ বছর বয়সে ফটকগোড়া স্টেশন রোডে অবস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাট্য আন্দোলনের এক মহান সৈনিক, গৃহী সন্ন্যাসী এবং বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় বোড়াইচণ্ডীতলার শ্মশানঘাটে।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর (রবিবার) নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বর্গগত নৃপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলীর একখানি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানের পরে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনিপুণ পরিচালনায় 'আলমগীর' নাটকটি মঞ্চস্থ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

ব্যক্তিঋণঃ

১. কালিদাস গাঙ্গুলী।

২. প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী।

পত্রিকা ঋণঃ

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর তৈলচিত্রের আবরণ উৎসবের জন্য প্রকাশিত স্মরণিকা।

কালিদাস গাঙ্গুলী

(জন্ম - ২০/০১/১৯৩৩)

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি চন্দননগর ফটকগোড়ায় পৈতৃক বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন কালিদাস গাঙ্গুলী। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে নৃপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী ও কমলা দেবী। ছয় পুত্রসন্তানের মধ্যে তিনি তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান। তাঁর স্ত্রীর নাম প্রীতি গাঙ্গুলী। তাঁদের দুটি কন্যা।

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীগাঙ্গুলী কলেজ দুপ্লেক্স (বর্তমান কানাইলাল বিদ্যামন্দির) থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করার পর প্রথমে কলকাতা টেলিফোনসে ও পরে ঐ সংস্থারই পানাগড় অফিসে কিছুদিন চাকরি করেন। সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে তিনি ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারশিপ পরীক্ষায় পাশ করে শ্যামনগরের ন্যাশানাল পাইপ্স্ এণ্ড টিউব্স্ কোম্পানিতে ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজারের পদে যোগদান করেন। পরে নাটকের স্বার্থে সে চাকরিও তিনি ছেড়ে দেন।

পানাগড়ে চাকরি করার সময়ে জীবনের প্রথম অভিনয় করেন স্ত্রী-চরিত্রে। 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে 'দ্রৌপদী'র ভূমিকায়। সেই অভিনয়টি হয়েছিল এম.ই.এস. অর্থাৎ 'মিলিটারি এঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস'-এর কর্মীদের আয়োজিত উৎসবে। তখন তাঁর বয়স ৫২/৫৩।

নাটকের সম্পর্কে তাঁর যে প্রেরণা তা তিনি পেয়েছেন তাঁর পিতা প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর কাছ থেকে। প্রেরণা ও উদ্দীপনা পেয়েছেন বিশিষ্ট নট ও নাট্যপরিচালক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকেও। এছাড়া তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন তাঁর স্ত্রী প্রীতি গাঙ্গুলীর কথা, যাঁর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনভাবেই অভিনয় করা সম্ভবপর হত না। এঁদের সকলের প্রতি তিনি তাঁর অকুণ্ঠ ঋণের কথা সর্বতোভাবে স্বীকার করেন।

চন্দননগরে ফিরে 'লা সোসিয়েতে দে পারেসে'তে কাকা হরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ঐতিহাসিক নাটক 'কেদার রায়'তে 'কার্ভালো' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর পরিচালনায় পৌরাণিক নাটক 'নর নারায়ণ' এ 'শ্রীকৃষ্ণ' এবং কর্ণার্জ্জুন' এ 'ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ' চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। সুনিপুণ পরিচালনার গুণে এবং তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে শেযোক্ত চরিত্রটিতে দীর্ঘ দিনের উপবাসী ও ক্ষুধার্ত বৃদ্ধের অভিনয়ের উৎকর্ষতা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে তার ফলে নিজে তো বটেই দর্শকমহলে পর্যন্ত তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। এটি যে তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয় একথা স্বীকার করতে তাঁর কোন কুণ্ঠা নেই। এছাড়া বিসর্জন (জয়সিংহ), চিরকুমার সভা (পূর্ণ), বায়েন (বায়েন) নাটকেও সসম্মানে অভিনয় করেছিলেন।

'বিসর্জন' ও 'বায়েন' নাটক দুটির প্রযোজনা করেছিলেন যথাক্রমে সি.সি ক্লাব এবং খলিশাগোড়া জগদ্ধাত্রী পুজা কমিটি।

'স্টুডেন্টস ড্রামাটিক ক্লাব' প্রযোজিত 'বিজয়া' এবং 'কালিন্দী' নাটক দুটিতে তিনি যথাক্রমে 'নরেন' এবং 'মহীন' এর চরিত্রে রূপদান করেছিলেন।

চন্দননগরে অধিক সংখ্যক নাটকে অভিনয় করতে না পারলেও রক্তে তাঁর অভিনয়ের নেশা থাকার ফলে পরবর্তীকালে তিনি যোগদান করলেন কলকাতার পেশাদারি মঞ্চে — প্রথমেই কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। 'এ্যান্টনি কবিয়াল' নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করার পর শেষে 'মামা'র চরিত্রে অভিনয় করেছেন যেটি আগে মিহির ভট্টাচার্য ও পরে বিধায়ক ভট্টাচার্য করতেন। সবিতাব্রত দত্ত, কেতকী দত্ত, কালীপদ চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র প্রমুখ অভিনেতা - অভিনেত্রীদের সঙ্গে তিনি এখানে প্রায় ৫০০ রজনী অভিনয় করেন।

হাওড়ার সালকিয়াতে শীষমহল মঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত 'দ্বিধা' নাটকে প্রথমে একটি বকাটে ছেলের চরিত্রে অভিনয় করলেও পরে নায়ক অসীম কুমারের অনুপস্থিতিতে নায়িকা তৃপ্তি মিত্রের বিপরীতে তিনি প্রায় ২০০ রজনী 'সাগর'-এর চরিত্রে রূপদান করেন। এই সময়ে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন তৃপ্তি মিত্র ও তরুণকুমার। ঐ মঞ্চেই পরের নাটক 'বিদ্যাসুন্দর'। তাতে 'বিদ্যা'ও 'সুন্দর' করতেন যথাক্রমে শমিতা বিশ্বাস ও রূপক মজুমদার। তাতে তিনি প্রথমে একজন 'সভাসদ' এর ভূমিকাতে থাকলেও পরে রূপক মজুমদারের অনুপস্থিতিতে 'সুন্দর' এর চরিত্রে দীর্ঘদিন অভিনয় করেন। পরের নাটক 'বিরাজ বৌ' এতে তিনি করতেন 'পীতাম্বর'। 'বিরাজ' ও 'নীলাম্বর' করতেন যথাক্রমে তৃপ্তি মিত্র ও তরুণ কুমার।

রঙমহল মঞ্চে 'অনন্যা' নাটকে প্রথমে অন্য চরিত্রে অভিনয় করলেও পরে নায়ক অসীমকুমারের অনুপস্থিতিতে জয়শ্রী সেনের (বহ্নি) বিপরীতে তিনি বেশ কিছুদিন 'স্মরজিৎ' চরিত্রে অভিনয় করেন।

শ্যামাপ্রসাদ মঞ্চে সমর মুখার্জী রচিত ও পরিচালিত 'বিষ' নাটকে তিনি সরাসরি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে বিশ্বজিৎ নায়ক হিসাবে যোগদান করায় তিনি বিকাশ রায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর খল চরিত্রের ভূমিকাতেও অভিনয় করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এখানে অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন অঞ্জনা ভৌমিক, মলিনা দেবী, বিকাশ রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ দত্ত, কালিপদ চক্রবর্ত্তী ও আরও অনেক। পেশাদারি মঞ্চে এই চরিত্রটিই যে তাঁর অভিনীত জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্র একথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

এরপর তিনি যোগদান করেন স্টার থিয়েটার মঞ্চে। সেখানে তখন দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত ও পরিচালিত নাটক 'শর্ম্মিলা' চলছে। তাতে তিনি নায়ক শুভেন্দু চ্যাটার্জীর

শিক্ষক হিসাবে ছিলেন। শুভেন্দুবাবুর অনুপস্থিতিতে তিনি প্রায় ১৫০ রজনী নায়ক 'সমীরণ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরের নাটক 'সীমা'তে তিনি নায়ক 'সমর'-এর চরিত্রে সতীশ ভট্টাচার্যের অনুপস্থিতিতে দীর্ঘদিন অভিনয় করেন। নায়িকা ছিলেন সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। পরের নাটক 'বিদ্রোহী নায়ক'। তাতে তিনি অভিনয় করেন 'শিবনাথ শাস্ত্রী'র ভূমিকায়।

পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে, মাঠে-ময়দানে অভিনয় করতে থাকেন একজন কুশলী যাত্রাশিল্পী হিসাবে। 'কল্যাণী অপেরা'র 'মঞ্জরী অপেরা' পালাতে 'বাবুল বোস' 'বেইমান পৃথিবী'তে নায়কের ভূমিকায় এবং 'দেবী চৌধুরাণী'তে 'ব্রজেশ্বর' করেন। তাতে প্রফুল্ল করেছিলেন রুবী দত্ত।

'রয়েল বীণাপাণি অপেরা'তে এক বছর ধরে অভিনয় করেন মঞ্জু দে'র সঙ্গে 'পসারিণী' পালায়।

চার বছর ছিলেন 'শিল্পীতীর্থ'তে জ্যোৎস্না দত্ত ও গুরুদাস ধাড়ার সঙ্গে। 'বৈজুবাওরা' (ভজনলাল), 'বসন্ত বাহার' (সারেঙ্গী বাদক), 'বিল্বমঙ্গল-চিন্তামণি' (নায়েব), 'বাদশাজাদী জাহানারা' তে (জাহাঙ্গীর) এবং সুপারহিট পালা 'প্রতিমা' এবং 'জয়া'তে তিনি 'জমিদার' এর চরিত্রে অভিনয় করেন।

কল্পলোক অপেরার 'মাটির প্রতিমা কাঁদে' পালাতেও তিনি একটি ভূমিকাতে অভিনয় করেন।

নট্ট কোম্পানিতে ছিলেন চার বছর। সেখানে বনবিবি চম্পা (ত্রৈলোক্যনাথ), অভিনয় নয় (বঙ্কু দাদু), কৃষ্ণ-ভগবান (শকুনি), বরণীয়া বধূ (পক্ষাঘাতগ্রস্ত শ্বশুর) এবং পালকি চলে রে (এক বেহারা) পালাগুলিতেও তিনি সুনামসহ অভিনয় করেন।

নির্মল মুখার্জীর সঙ্গে মুক্তাঙ্গন যাত্রাসমাজে 'নগ্ন সমাজের কুললক্ষ্মী' পালাতেও তিনি ঠাকুর্দার চরিত্রে অভিনয় করেন।

'তারামা অপেরা'য় 'স্বামীর চেয়ে দামী বাবা' তে 'শ্বশুর' 'রক্তাক্ত মসনদ' যেটি দূরদর্শনে প্রায়ই প্রচারিত হয়ে থাকে তাতেও তিনি অভিনয় করেন।

'ভারতী অপেরা' তে সন্তু মুখার্জীর সঙ্গে 'ইতি তোমার রঞ্জনা', 'জনতা অপেরা'র 'স্বামী নগদ স্ত্রী ধার', 'লোকনাট্য' তে 'শাহী কিল্লাদার' ও 'জননী এক জংশন' পালাতেও তিনি অভিনয় করেন।

রাতের রজনীগন্ধা (উত্তম কুমার ও অপর্ণা সেনের সঙ্গে), এপার-ওপার (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেনের সঙ্গে) এবং আরও কয়েকটি চলচ্চিত্রেও তিনি অভিনয় করেছেন।

'ক্ল্যাসিক চন্দননগর' এর ২০ বর্ষপূর্তি নাট্য উৎসব - ৯২ তে বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব হিসাবে চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত ০৮.১২.১৯৯২ তারিখে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে মানপত্রসহ একটি স্মারক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।